Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Rootless peoples' quest for existence: In the context of Prafulla Roy's novel

অস্তিত্বের খোঁজে ছিন্নমূল মানুষঃ প্রেক্ষিত প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস

Amrita Saha
Dept. of Bengali, Tripura University, Agartala, Tripura, India

Abstract

The partition of India divided the Bengalee race into two groups named Hindu and Muslims. The 'Two-Nation- Theory' gave birth of two countries India and Pakistan. In that scenario the Muslims of Kolkata went to East Pakistan and from there the Hindus also came to West Bengal and Tripura. Those destitute and home-less people took shelter in the station platform and in refugee camps. Through much negligence and dishonor they get the new identity named 'Refugee'. Thus their struggle for existence began.Contextually worth-mentioning that many of the litterateur of Bengal in the 5th Decade was the victim of partition and Prafulla Roy also belongs to that group. This mentality of a refugee inspires Prafulla Roy to create some of his novels like—'keya Patar Nauka'(1969), 'Shatadharay Baye Jay'(2008), 'Uttal Samayer Itikatha'(2014), 'Nona Jal Mithe Mati', 'Bhagabhagi'(2001), 'Shindhuparer Pakhi'(1958) and many others. In my final paper it will be discussed elaborately how Prafulla Roy has depicted in reality the crisis, struggle, pain and disaster of the rootless people of that period.

Keywords : Crisis, Struggle, Refugee, Rootless, Prafulla Roy

Article

১৯০৫ সালে গৃহীত বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক ঐক্যের কথা বারবার উচ্চারিত হলেও সেই আকাঙ্ক্ষিত মিলন থেকে গিয়েছিল অধরা। ১৯৪৭ সালে প্রায় দু'শো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ভারত স্বাধীন হলেও সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সমানভাবে সেই আনন্দঘন মুহূর্তটিকে উপভোগ করতে পারেনি কারণ স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়টি ছিল ১৯৪৬ সালে সংঘটিত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা যা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে পরিচিত, তার চরম নৃশংসতায় কলঙ্কিত। তাছাড়া 'নোয়াখালি'র পাশবিক সংঘাত, বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার নীতি ইত্যাদি অমানবিকতার স্মৃতিও অমলিন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশে কলকাতা থেকে মুসলমানেরা চলে যেতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানে ও সেখান থেকে হিন্দুরা দেশত্যাগ করে আসতে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়। পশ্চিমবঙ্গে আগত সেই সহায়সম্বলহীন মানুষদের স্থান হয় শিয়ালদহ, বনগাঁ, দর্শনা, বার্ণপুর, দমদম ইত্যাদি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ও বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে। গৃহহীন সেই মানুষগুলির নতুন নামকরণ হয় 'উদ্বাস্তু'।

মলিন, বেআব্রু জীবনযাপনে বাধ্য মানুষগুলির শরীর ও মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকে সভ্যতা-ভদ্রতার সমস্ত আবরণ। মাথাপিছু সামান্য সরকারি বরাদ্দ খাদ্য, তৃষ্ণার জলের জন্য মারামারি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে রোগ-শোক প্রভৃতি সৃষ্টি করেছিল প্রতিমুহূর্তের এক শ্বাসরোধকারী হাহাকার। রাতের অন্ধকারে বেআব্রু মানুষগুলির মানসম্মান বিসর্জিত হয়েছে বহুবার। সরকারি ক্যাম্প এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রথমদিকে তাদের সহায়তায় এগিয়ে এলেও ধীরে ধীরে আশ্রয়প্রার্থী মানুষের সংখ্যা এতটাই বাড়তে থাকে যে, ১৯৪৮ সালের পর আগত

শরনার্থীদের সরকারিভাবে উদ্বাস্তু সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে উদ্বাস্তুরা তখন দখল করতে শুরু করে জমিদার-জোতদারদের বাড়ি, জমি, সরকারের খাস-জমি ইত্যাদি; গড়ে উঠতে থাকে রিফিউজি কলোনী। জমির মালিকদের পোষা গুন্ডা, পুলিশ ও প্রশাসনের হৃদয়হীন ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে শুরু হয় তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।

দেশভাগের ফলে হঠাৎ-ই স্বদেশের সংজ্ঞা বদলে গেলে বিমূঢ় মানুষ পায়ে পায়ে পেরিয়ে এসেছিল তাদের চেনা মাটি, গাছপালা, নদী, আকাশ। পূব থেকে পশ্চিমে অথবা পশ্চিম থেকে পূবে এই অনিচ্ছাকৃত যাওয়া-আসার পথে অনেকেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এবং বাকিদের ভাগ্যে ছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অবিরাম পথচলা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পাঁচের দশকে বাংলার যে সকল কথাকার আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের পিতৃভূমিই ছিল পূর্ববাংলা; বহু শতাব্দীর ব্যবধানেও প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই পিতৃভূমির প্রতি যে নাড়ির টান থেকে যায়, তাঁরাও এর ব্যতিক্রম নন। দেশভাগের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিঘাতে মানুষের বর্হিজীবনে এবং মনস্তত্ত্বের গভীরে যে সংকট তৈরি হয়েছিল তার বহুমাত্রিক ছবি গভীরতা নিয়ে উঠে এসেছে সেই সাহিত্যিকদের রচনার প্রধান বিষয়বস্তু রূপে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় যাঁকে একদিন তাঁর পরিবারসমেত পশ্চিমবাংলায় পাড়ি দিতে হয়েছিল উদ্বাস্তু অভিধায় অভিহিত হয়ে। তাঁর নিজের ভাষায়—

"যুদ্ধের শুরু থেকে দেশভাগ এবং তার পরবর্তী সময়ে সারা ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলা জুড়ে যে মহাতমসা নেমে এসেছিল আমি বা আমার মতো অসংখ্য মানুষ, সেই ক্রান্তিকালের সাক্ষী। শুধু নিরাসক্ত দর্শকই নয়, এই চরম দুঃসময় আমাদের ভেঙ্গেচুরে দুমড়েমুচড়ে নতুন করে সৃষ্টি করেছে।"[১]

নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আসার পর তিনি আর কোনওদিন পূর্ববাংলায় যাননি; নিজেকে যেন স্বেচ্ছায় তিনি 'ছিন্নমূল' করে রেখেছেন এবং সম্ভবত এই মানসিক অবস্থা থেকেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক আশ্চর্য শিল্পীসত্তা, যার সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মে; যেমন-- 'কেয়াপাতার নৌকা' (প্রথম খন্ড) [১৯৬৯ খ্রিঃ প্রকাশিত], 'শতধারায় বয়ে যায়' (দ্বিতীয় খণ্ড) [২০০৮খ্রিঃ প্রকাশিত], 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা' (তৃতীয় খণ্ড) [২০১৪ খ্রিঃ প্রকাশিত], ' নোনা জল মিঠে মাটি' [প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র(২) এর অন্তর্ভুক্ত, প্রকাশকালঃ ২০০৩], 'সিন্ধুপারের পাখি' (১৯৫৮ খ্রিঃ প্রকাশিত), 'ভাগাভাগি' (২০০১ খ্রিঃ প্রকাশিত), 'একটা দেশ চাই' 'এখানে পিঞ্জর' (রচনাসমগ্র- ২) 'নাগমতী', 'নদীর মতো', 'আমার নাম বকুল', 'বাতাসে প্রতিধ্বনি', ইত্যাদি অসংখ্য উপন্যাস এবং 'অনুপ্রবেশের' মত গল্পগ্রন্থ।

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'কেয়াপাতার নৌকা' উপন্যাসের কাহিনির সুচনা ১৯৪০ এর অক্টোবর মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা তখনও অব্যাহত; এর পাশাপাশি মহামন্বন্তর, যুদ্ধের অবসান, দাঙ্গা ও দেশভাগ জাতির জীবনে এসেছিল হাত ধরাধরি করে। উপন্যাসের নায়ক বিনয় ওরফে বিনু যখন বারো বছরের কিশোর তখন প্রথম পূর্ববঙ্গের রাজদিয়া গ্রামে আসে এবং তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে জল-জঙ্গল পরিবৃত, মানুষের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসা সমন্বিত বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের ছবি। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের করালগ্রাসে এবং পরবর্তী দেশভাগের কড়ানাড়ায় রাজদিয়ার পরিবেশ পাল্টাতে থাকে; শুরু হয় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, কালোবাজারি, মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস। দাঙ্গা চলাকালীন হাজার হাজার মেয়ের মতোই ধর্ষিত ঝিনুককে নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দিতে বাধ্য হয় বিনয়। বালক বিনুর প্রথম রাজদিয়ায় আসার মুগ্ধ বিস্ময় শেষ হয় আতঙ্কের বিদায়ের মধ্যে।

উক্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ড 'শতধারায় বয়ে যায়' এ দেখা যায় উদ্বাস্তু সমস্যা কোলকাতার রোজনামচায় পরিণত। এখানেও বিনয় ও ঝিনুকের সম্পর্কের যাত্রাপথের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তুলে ধরলেন যে দেশভাগ কীভাবে মানুষের

মানবিকতার পশুত্বের স্তরে অবনমন, নারী অস্তিত্বের বিপন্নতা ইত্যাদির ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করেছে । যার ফলে বিনয়-ঝিনুকের মত অসংখ্য স্বপ্নাদর্শী নবপ্রান অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

একসময় আন্দামান ছিল কালাপানির মাঝখানে ভয়ঙ্কর দ্বীপমালায় অপরাধীদের পেনাল কলোনি নামে পরিচিত। নিজ দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার কর্মযজ্ঞে আত্মবলিদানে উদ্যত অদম্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মত 'কুখ্যাত অপরাধীদের' ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেখানে নির্বাসিত করত। কিন্তু বিদেশি শাসকদের হৃদয়-হীনতাও যে অস্বাস্থ্যকর ও স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বেশিদিনের জন্য বসতি গড়তে পারেনি, আমাদের স্বদেশি ক্ষমতা লোভীদের নির্লজ্জ হৃদয়হীনতায় সংগঠিত দেশভাগ আবার সেখানে প্রতিষ্ঠিত করল অন্যধরনের এক পেনাল কলোনি। চারিদিকে নিবিড় অরণ্য, পদে পদে মৃত্যুভয়, অকর্ষিত জমিকে উর্বরা করে তোলার চেষ্টা, জীবনধারণের তাগিদে আজন্ম চাষিদের শিকার বৃত্তি গ্রহণ-- বিভাগোত্তর বাঙালির যাপিত জীবনের এই দুর্বিষহ পরিণতির বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে। দেশভাগ কিভাবে হরণ করেছে নারীর আব্রু, সুস্থ-স্বাভাবিক, প্রাণোচ্ছাসে পরিপূর্ণ নারীরা কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে মানসিক ভারসাম্যহীন, মৃতবৎ একটি শরীরে তার উদাহরণ কাপাসী চরিত্রটি। কাপাসীর পিতা নিত্য ঢালীর মুখে ধ্বনিত হয়েছে সেই বীভৎসতায় পিষ্ট মানুষের হাহাকার --

"চৌখের উপুর যা দেখলাম, পারি না, কুনো দিন ভুলতে পারি না। হা ঈশ্বর, অ্যামন সোন্দর পিরথিমী বানাইছ, অ্যামন সোন্দর মানুষ বানাইছ , কিন্তুক তার মনে এত পাপ দিলা ক্যান? "[২]

১৯৪৬ সালে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রজ্জ্বলিত দাঙ্গার আগুনের স্মৃতিতে প্রফুল্ল রায় লিখলেন 'ভাগাভাগি' উপন্যাসটি। এই দাঙ্গায় আসমুদ্র হিমাচল বহুকালের সহিষ্ণু এই দেশে রক্তের স্রোত বয়েছিল; যার ফলে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি। পারস্পরিক বিদ্বেষ, অবিশ্বাস এবং ঘৃণার আবহাওয়ায় বিষাক্ত সমাজে দুটি আত্মীয়সম ভিন্নধর্মী পরিবার কিভাবে আত্মরক্ষার জন্য পা বাড়ায় অজানার উদ্দেশ্যে তাই চিত্রায়িত হয়েছে লেখকের কলমে।

'এখানে পিঞ্জর' উপন্যাসে পরিচয় হয় দেশভাগের কলঙ্ক নিয়ে উঠে আসা এক উদ্বাস্তু পরিবারের যুবক নবেন্দুর সাথে। জীবিকার সন্ধান তাকে বাধ্য করেছিল মুম্বাইয়ের অপরাধ জগতে পা রাখতে। অন্য অনেকের মতোই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে তলিয়ে জেতে জেতে একদিন সে নিখোঁজ হয়। তার বোন নীলাকে ঘাড়ে তুলে নিতে হয় পুরো পরিবারের অন্ন যোগান দেবার দায়িত্ব, এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সমাজ তাকে দিতে পারেনি কোন সুস্থ উপার্জন মাধ্যম এখানে লেখক আমাদের জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসটির কথা মনে করিয়ে দেন।

'আমার নাম বকুল' উপন্যাসের বকুল ও বিজন এমন দুটি চরিত্র, যারা সেই অস্থির পরিস্থিতিতে নিজেদের পরিবারের বোঝা টানতে গিয়ে যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছিল নিজেদের সুখের নীড় গড়ার স্বপ্নকে। 'এখানে পিঞ্জর' উপন্যাসের নীলা, 'আমার নাম বকুল' উপন্যাসের বকুল এমন বহু মেয়ের প্রতিনিধি যারা নিজের ও নিজ পরিবারের নূন্যতম অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান যোগানের তাগিদে নিজেদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সভ্যতার অন্ধকার চোরাগলিতে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে সামাজিক অস্থিরতা, বেকারত্ব, মূল্যবোধ নামক বস্তুটির বিনষ্টি সব মিলিয়ে তৎকালীন কলকাতার অস্থির, অমানবিক প্রেক্ষাপটে দুটি তরুণ-তরুণীর কাহিনি 'আলোয় ফেরা' উপন্যাসটিও।

'একটা দেশ চাই' উপন্যাসে দেখা যায় ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঁচ এসে লাগে বিহার রাজ্যেও; হাজার হাজার নিরীহ মানুষ খুন হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর লক্ষ লক্ষ বিহারীর সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসের কলিমুদ্দিনের

মত মানুষেরাও চলে যায় পূর্ববাংলায় নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের খোঁজে। কিন্তু নবগঠিত বাংলাদেশে তারা পরিণত হয় অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্রে। ফলে নিরুপায় হয়ে তারা আবার ফিরে আসতে থাকে জন্মভূমি ভারতে। কিন্তু এখানেও এবার তাদের পরিচয় হয় অনুপ্রবেশকারী রূপে। ব্রিটিশ রাজত্বে তারা ছিল ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানি, তারও পর বাংলাদেশি; ছিন্নমূল মানুষের নিজ শিকড়ের সন্ধানে এক জীবনে বহুবার নাগরিকত্ব বদলের এই মর্মান্তিক পরিহাসের চিত্রে সমৃদ্ধ উক্ত উপন্যাস। প্রফুল্ল রায় রচিত 'বিন্দুমাত্র' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'কাসেম আলি, ফকিরা, আনোয়ার এবং অনুপ্রবেশ' নামক প্রবন্ধে আনোয়ার চরিত্রটিকেও আলোচ্য সংকটের শিকার হিসেবে দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থের আরেকটি প্রবন্ধ – 'রস আইল্যান্ডে চল্লিশ মিনিটে দশটি বিয়ে' তে দেখা যায় সেই ছিন্নমূল মানুষদের একটি নবজীবন পাইয়ে দেবার প্রচেষ্টাও ছিল আরেকটি বিপ্লবের সমার্থক। হতভাগ্য, কেন্দ্র-চ্যুত, দরিদ্র বিভিন্নজীবি বাঙালীকে নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখতেও সাহায্য করেছিল কিছু সংখ্যক লোক; যাদের মধ্যে 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে ব্যক্ত পাগলা পাল সাহেব, লা-তের মত চরিত্ররা ছিল অন্যতম।

দেশভাগ শুধুমাত্র একটি আলোচনার বিষয়বস্তু নয় অথবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিক্ষিপ্ত ঘটনাও নয়। বর্তমানে কয়েক দশক পরেও তার অনুরণন অনুভব করা যায়; ধারাবাহিক চক্রবৃদ্ধি হারে সে কুফল প্রভাব বিস্তার করছে আজও। একদল মানুষ যখন অপর কিছু মানুষের কাছেই পরাজয় স্বীকার করে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে জন্মস্থান, নিঃশেষ হতে দেখেছে নিজ অন্দরমহলের আব্রু তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ধ্বস্ত হয়েছে তাদের পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা। বহু-ভাষাভাষি, বহু বর্ণ, বহু জাতি সমন্বিত একটি দেশ তখনই সুস্থ ভাবে এগিয়ে যাবে যখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ একজোট হয়ে বিপদের দিনে এগিয়ে যাবার মানসিকতা রাখবে। কিন্তু একটি জনজাতির প্রায় অর্ধেক মানুষ যখন উদ্বাস্তু, অনুপ্রবেশকারী ইত্যাদি পরিচয়ে লাঞ্ছিত তখন তাদের কাছ থেকে দেশমাতৃকার উন্নতি সাধনে আত্মত্যাগ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই আজও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে দেশত্যাগ। নিজ পারিপার্শ্বিক সমাজ, সরকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত যুবসমাজ প্রায়ই বিদেশ যাত্রাকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু মনে করছে। আজও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় উভয়ের কাছে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। প্রফুল্ল রায়ের ভাষায় --

"দুই তীরে অফুরান ফসলের খেত
কিছু ধান উঠে গেছে
বাকি সব সোনালি লাবণ্যে ভরা – দিগন্ত অবধি
দূরে দূরে নিবিড় বনানী
ধানবন, আকাশের পাখি, উতরোল বয়ে চলে নদী
বাংলার মুখ হাজার বছর ধরে যেমন কোমল
তেমনই তো আছে
তবু বদলে গেছে অনেক কিছুই
বাতাস বিষবাষ্পে ভরা - সন্দেহে, আতঙ্কে, অবিশ্বাসে,
ঘাতকের হুঙ্কারে ..."[৩]

দেশ দ্বিধাবিভক্ত হলে বিভিন্ন সামাজিক সুবিধা, শান্তি-সম্প্রীতির অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে যা ভাবা হয়েছিল তা ছিল কল্পনামাত্র। দেশভাগ কোন নতুন দিনের আশার বাণী শোণায়নি, অতীতের দ্বন্দ্ব -সংঘাত–হানাহানির বিষবাষ্পে মথিত হয়েই শুরু হয়েছিল নয়া যাত্রা। তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'সময়ঃ সমাজঃ সাহিত্য' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন --" দেশভাগ–বাস্তুচ্যুতি–প্রব্রজন তো একক ব্যক্তির সঙ্কট নয় ; জনগোষ্ঠীর একটি বিপুল অংশ অনিকেত হয়ে উণ্মূল

শিকড়ের শোকে পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে গেছে।"[৪] কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় একটি বিশেষ অঞ্চল থেকে কৈশোরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে সারা যৌবনকাল ধরে খুঁজে বেড়িয়েছেন নিজের সত্তার স্বরূপকে এবং বার্ধক্যে পৌঁছে আজও তাঁর এই সন্ধান অব্যাহত। ফলে একদিকে স্মৃতিবাহিত শৈশব ও কৈশোরকে যেমন তুলে ধরেছেন তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস ও ছোটগল্পে, তেমনি পাশাপাশি নিজেকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন সমগ্র ভারতের জনসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত করার সাধনায়। নিজের বাস্তুচ্যুতি, তাঁকে যেন মানব চরিত্র সম্পর্কে জানার বিষয়ে আরও আগ্রহী করে তুলেছিল। দেশভাগ শুধুমাত্র একটি দেশের রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক বিভাজন মাত্র নয়, ভাগ হয়েছিল সমাজ, সংস্কৃতি; বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল জীবন ও জীবিকায়, দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে মানুষের মন। ভারতের ক্ষেত্রে এই পীড়া ছিল আরও মর্মান্তিক; কারণ স্বাধীনতার আনন্দের সাথেই জড়িয়ে ছিল সেই বেদনা। বিভাজনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঘাতে জর্জরিত মানুষের সঙ্কট, সংগ্রাম, তাদের আত্মপরিচয়ের এক গভীর অসুখ, শিকড় সন্ধানী মানুষের মনস্তত্ত্ব বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিনায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। সেই স্বতন্ত্র ধারার যোগ্যতম ধারক ও বাহকের মর্যাদায় প্রফুল্ল রায় সর্বকালে স্বরণীয় হয়ে থাকবেন ।

উল্লেখপঞ্জিঃ

১) প্রফুল্ল রায়, 'লেখালেখি প্রসঙ্গে', 'প্রফুল্ল রায় ৭৫', করুণা প্রকাশন, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১০, পৃঃ ৫০৬

২) প্রফুল্ল রায়, 'নোনা জল মিঠে মাটি', 'প্রফুল্ল রায় রচনা সমগ্র (২)', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃঃ ৯৫

৩) প্রফুল্ল রায়, 'জলে স্থলে আকাশতলে', 'প্রফুল্ল রায় ৭৫', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১০,পৃঃ ৫২৮

৪) তপোধীর ভট্টাচার্য, 'সময়ঃ সমাজঃ সাহিত্য', পৃঃ ৪৩

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থঃ

১) প্রফুল্ল রায়। 'রচনা সমগ্র (২)'। কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশং; প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি, ২০০৩।

২) প্রফুল্ল রায়। 'একটা দেশ চাই'। কলকাতাঃ 'পত্রভারতী'; প্রথম প্রকাশঃ আগরতলা বইমেলা, ফেব্রুয়ারি, ২০১০।

৩) প্রফুল্ল রায়। 'ভাগাভাগি'। কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং; প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল, ২০০১।

৪) প্রফুল্ল রায়। 'কেয়া পাতার নৌকা'। কলকাতাঃ করুণা প্রকাশনী; প্রথম অখণ্ড প্রকাশঃ কলকাতা বইমেলা, ২০০৩।

৫) প্রফুল্ল রায়। 'শতধারায় বয়ে যায়'। কলকাতাঃ করুণা প্রকাশনী; প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা বইমেলা, ২০০৮।

৬) প্রফুল্ল রায়। 'বিন্দুমাত্র'। কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং; প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি, ১৯৯৫।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১) উজ্জ্বল কুমার মজুমদার। 'উপন্যাসে জীবন ও শিল্প'। কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; প্রথম প্রকাশঃ ৩০ শ্রাবণ, ১৩৮৪।

২) তপোধীর ভট্টাচার্য। 'সময়ঃ সমাজঃ সাহিত্য'। কলকাতাঃ এবং মুশায়েরা; প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ২০১০।

৩) তারক সরকার। 'বাংলা উপন্যাসে দেশবিভাগ ও দেশত্যাগ'। কলকাতাঃ অরুনা প্রকাশন; প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।

৪) ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'। কলকাতাঃ ইউনাইটেড বুক এজেন্সি; প্রথম প্রকাশঃ ১৮ আগস্ট, ২০১০।

৫) সৌমেন চক্রবর্তী। 'উদ্বাস্তু জীবন ও মানবাধিকার'। কলকাতাঃ মুক্তমন; প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি, ২০০৩।

৬) ড. সত্যবতী গিরি, ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত)। 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন'। কলকাতাঃ রত্নাবলী; প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৯৭।

সাময়িক পত্রঃ

১) রায় প্রফুল্ল। 'আয়নায় নিজের মুখ', 'দেশ', ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ/ ১৯৭৬ খ্রিঃ, সাহিত্য সংখ্যা, পৃঃ ১৭৮।